প্রাণী সম্পদ সুরক্ষা কি

সূত্রঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ, উত্তর দিনাজপুর, রায়গঞ্জ

প্রাণী স্বাস্থ্য সুরক্ষা কি

- রোগ প্রতিরোধই রোগ নিরাময়ের প্রকৃষ্ট উপায়।
- সে জন্য সময় মতো রোগ প্রতিরোধের উপায়গুলি জেনে নিতে হয়।
- সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সঠিক খাদ্য ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বাসস্থান নির্দিষ্ট করতে হয়, সেইমত, নিয়মমাফিক প্রাণী পরিসেবার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হয়। প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধক টিকা দান, কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ, বন্ধ্যাত্ব নিবারণ ও বাসস্থান নিয়মিতভাবে জীবাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শোধন করা দরকার।
- অসুখ হলে, কাল বিলম্ব না করে অসুস্থ প্রাণীকে পৃথকীকরণ করে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়।
- চিকিৎসকের পরামর্শমত সঠিকভাবে ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগের উপশম হয়, রোগ বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়, প্রাণী স্বাস্থ্যও সেজন্য সুরক্ষিত থাকে।

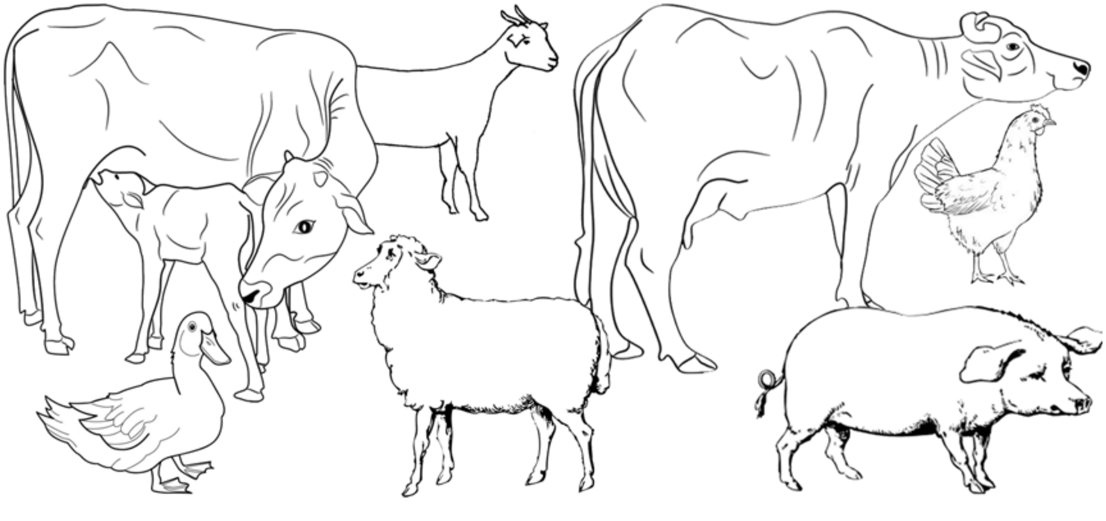

আপনার গৃহপালিত প্রাণী সম্পদকে সুস্থ, নিরোগ ও উৎপাদনক্ষম রাখতে মারাত্মক সংক্রামক রোগগুলির বিষয়ে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় তথ্য জানুন এবং তা থেকে নিবারণের উপায়গুলি সম্বন্ধে নিজেরাও অবহিত হন ও অন্যান্যদেরও অবহিত করান।

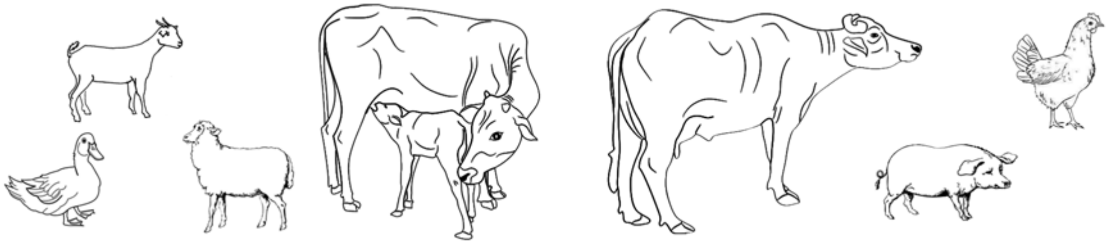

গরু ও মহিষ

এঁসো (FMD)ঃ

এই রোগে ছোট বড় সব বয়সের গরু মহিষ আক্রান্ত হয়। এটি বছরের যে কোন সময় হতে পারে। এটি একটি ভাইরাস বা জীবাণু-জনিত রোগ। গরু বা মহিষ আক্রান্ত হলে ১০৪-১০৬ ডিগ্রী F পর্যন্ত জ্বর হয়। দুই একদিনের মধ্যে মুখ থেকে লালা পড়তে থাকে। জিহ্বার উপরে ও মাড়িতে এবড়ো-খেবড়ো (Irregular Shape) ঘা হয় ও মুখে দুর্গন্ধ হয়। কিছু খেতে পারে না। পায়ের খুরের মাঝখানে ঘা ও পুঁজ হয়। হাঁটতে কষ্ট হয়। আক্রান্ত সংকর জাতের বাছুর ও দেশি বাছুরও বহুলাংশে মারা যায়। বড় গাভি ও মহিষের দুধ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়। বলদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় ও চাষের কাজ ব্যাহত হয়। গর্ভবতী গরু/মহিষের অকাল প্রসব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রোগের জীবাণু হৃৎপিন্ডে বাসা বাঁধার ফলে গরু মহিষের কর্মক্ষমতা ও শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। রোগের জীবাণু 20 Km পর্যন্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোনও গোয়ালে একবার এই রোগের সংক্রমণ ঘটলে আশপাশের গ্রামে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিষেধক টিকাঃ

দু মাস বয়সের বাছুরকে প্রথম টিকা দিন–প্রথম টিকার তিন মাস পরে প্রথম বুষ্টার টিকা দিন–প্রথম বুষ্টারের ছয় মাস বাদে দ্বিতীয় বুষ্টার টিকা দিন। এরপর প্রতি ৬ মাস অন্তর বছরে ২ বার এই রোগের টিকা দিন।

তড়কা (Anthrax)ঃ

জীবাণু (Bacteria) জনিত এই রোগটি হল সব বয়সের গৃহপালিত পশু সম্পদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ। আক্রান্ত পশু থেকে এই রোগ মানুষের মধ্যেও সংক্রামিত হতে পারে। আক্রান্ত প্রাণী ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরে প্রথমে প্রবল জ্বর হয় (১০৬-১০৭ ডিগ্রী F) এবং প্রচন্ড কাঁপুনি হয় ও পেট ফুলে যায়। নাক, মুখ ও

মলদ্বার দিয়ে কালো রক্ত বের হয়ে আসতে পারে। অনেক সময় কোন লক্ষণ প্রকাশ ছাড়াই গরু/মহিষ মারা যায় (Per-quete)। বছরের যে কোন সময়েই এই রোগ হতে পারে। তবে বর্ষার পরেই এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

প্রতিষেধক টিকাঃ

৩-৪ মাস বয়সে টিকা দেওয়া যায়। বর্ষার পূর্বে (Feb - May) এই রোগের টিকা দেওয়া হয়। তারপর প্রতি বছরই সংক্রামিত এলাকায় টিকা দেওয়া হয়।

গলাফোলা (H.S.)ঃ

সমস্ত বয়সের গরু/মহিষের ক্ষেত্রে এটিও একটি জীবাণু (Bacteria) জনিত সংক্রামক রোগ। বর্ষার পরেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। দেহের তাপমাত্রা ১০৪-১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত হয়। গলা ও গলকম্বল (Dewlep) ফুলে যায়। প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হয়। চোখ, মুখ, নাক দিয়ে জল পড়ে। রক্ত মিশ্রিত পাতলা পায়খানা হয়। বিনা চিকিৎসায় ৪৮-৭২ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত প্রাণী মারা যেতে পারে।

প্রতিষেধক টিকাঃ

বর্ষার পূর্বে (Feb-May) ৩-৪ মাস বয়সে এই রোগের টিকা দেওয়া যায়। তারপরে প্রতি বছর এই টিকা দিতে হয়।

বজবজে (B.Q.)ঃ

এটিও একটি জীবাণু (Bacteria) জনিত রোগ। বাছুরের ক্ষেত্রে এটি সংক্রামক রোগ হিসেবে দেখা দেয়। দুই থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত রোগে আক্রান্ত হলে শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয় (১০৪-১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত)। শ্বাসকষ্ট ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রদাহ যুক্ত ফোলা দেখা যায়। পাছার পেশী (Glutel Muscle) বেশি আক্রান্ত হয়। ফোলা স্থানে চাপ দিলে বজবজে (Crepitating) শব্দ হয় এবং আক্রান্ত স্থান কালো হয়ে যায়। বাছুর পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে প্রচন্ড কষ্ট পায়। চিকিৎসার অভাবে আক্রান্ত প্রাণী ৩-৫ দিনের মধ্যে মারা যায়।

প্রতিষেধক টিকাঃ

বর্ষার পূর্বে ৩-৪ মাস এই রোগের টিকা দেওয়া হয়। তারপর ২ বছর পর্যন্ত প্রতি বছর টিকা দেওয়া যায়।

মুরগির রাণীক্ষেত

এটি একটি ভাইরাস ঘটিত (virus) রোগ। মুরগীর ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক রোগ হিসেবে দেখা দেয়। এই রোগে ৭০% - ৮০% মুরগী মারা যায়। ছোট মুরগির মধ্যে মৃত্যুর হার বেশি। শ্বাসকষ্ট, কাঁপুনি, নাক, মুখ, চোখ দিয়ে জল পড়া রোগের অন্যতম লক্ষণ। মাথা, পা ও পায়খানার নাড়ি আক্রান্ত হয় এবং ঐ অংশগুলি অবশ হয়ে যায়। মুরগি খেতে পারে না ও ডিমের উৎপাদন ভীষণভাবে কমে যায়। এই রোগের জীবাণু বাতাস ও পারিপার্শ্বিক দূষিত পদার্থের মাধ্যমে অন্যান্য মুরগির মধ্যেও সংক্রামিত হয়।

প্রতিষেধক টিকাঃ

- ৫ – ৭ দিন বয়সে RDF স্ট্রেন্।
- ৪ সপ্তাহ বয়সে ঐ RDF স্ট্রেন্।
- ৬ – ৮ সপ্তাহ বয়সে R2B স্ট্রেন্। টিকা দেওয়ার পূর্বে কৃমির ঔষধ খাওয়ানো প্রয়োজন। অন্যথায় মুরগি খোঁড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মুরগির গাম্বারো ডিজিজ (IBD)ঃ

বর্তমান দিনে এই সংক্রামক (Virus) রোগটি একটি অন্যতম প্রাণঘাতী রোগ। ৫-৭ সপ্তাহ বয়সের মুরগির মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। রোগটি খুব দ্রুত একই মুরগির খামারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মুরগির থাই (Thigh) ও বুকে রক্তের ছোট ফোটা দেখা যায়। মুরগির বাসা প্রধানত আক্রান্ত হওয়ার ফলে মুরগির শরীরের সমস্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং শরীরে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এমনিতে মৃত্যুর হার কম থাকে কিন্তু ডিমের উৎপাদন কমে যায়। মুরগির বার্সা কাটলে দেখা যায় হলুদ চটচটে পদার্থ এবং বার্সার সাইজ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

প্রতিষেধক টিকাঃ

জলে গুলে খাওয়ার জন্যে বাণিজ্যিক কোম্পানীর টিকা পাওয়া যায়।

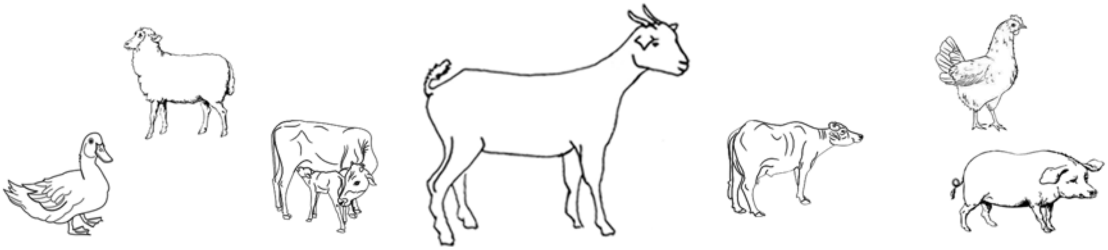

ছাগলের পি.পি.আর (P.P.R.)

গত ২-৩ বছরের মধ্যে এটি ছাগলের ক্ষেত্রে একটি প্রচন্ড সংক্রামিত মহামারী হিসেবে দেখা দিয়েছে। এটিও একটি জীবাণু (Virus) জনিত সংক্রামক রোগ। এটি পূর্বে আমাদের পশ্চিমবাঙলায় ছিল না। দক্ষিণ ভারত থেকে কয়েক বছর পূর্বে আমাদের পশ্চিমবাঙলায় এই রোগের বিস্তার ঘটেছে। ছাগল এবং ভেড়া-ই এই রোগে প্রধানত আক্রান্ত হয়। পাতলা পায়খানা, ১০৪ - ১০৬ পর্যন্ত জ্বর, শুকনো খসখসে মুখের চামড়া, চোখ, মুখ ও নাক দিয়ে ঘন লালার মত পদার্থ পড়া, মুখের মাড়িতে ও জিহ্বায় ঘা এই রোগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। গর্ভবতী ছাগি অকাল প্রসব করে। অত্যধিক পাতলা পায়খানার ফলে শরীর শুকিয়ে যায়, খেতে পারে না ও আক্রান্ত পশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। ৭ - ১২ দিনের মধ্যে বিনা চিকিৎসায় ছাগল মারা যায়।

প্রতিষেধক ব্যবস্থাঃ

যে অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সেখানে আক্রান্ত প্রাণীকে কেন্দ্র করে বৃত্তের আকারে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। ছাগলকে T.C.R.P. রোগের টিকা দেওয়া যায় ও আক্রান্ত ছাগলকে রোগের লক্ষণ অনুসারে (Symptomatic) চিকিৎসা করা হয়।

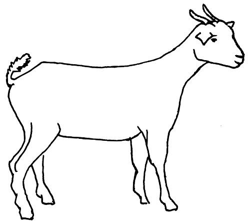

গাড়োল ভেড়ার পরিচয় নিয়ে কথা

গৃহপালিত প্রানীদের মধ্যে ভারতবর্ষের অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে, মানব সভ্যতা সময় থেকে ভারতবর্ষে ভেড়া মানুষ পালন করে আসছে, বিভিন্ন রাজ্য ভেড়াপালনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় কম, ভেড়া থেকে মাংস, চামড়া, পায়খানা থেকে সার ও পশম পাওয়া যায়, তবে এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, বৃষ্টির সময় জলে দাঁড়িয়ে এবং খাবার খেতে পারে, ভেড়া পালনে পুঁজি কম লাগে, সাধারনত ভারতবর্ষে ৪৪ প্রজাতি ভেড়া দেখতে পাওয়া এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪টি প্রজাতির ভেড়া দেখা যায়-

ক) ছোটনাগপুর, খ) সাহাবাদি,
গ) বনপালা, ঘ) গাড়োল,

৪ প্রজাতির মধ্যে কেবলমাত্র গাড়োল প্রজাতির মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অদ্ভুত, দু বছরে ৩ বার বাচ্চা দেয় প্রতি প্রসব কালে ২ অধিক পর্যন্ত বাচ্চা দিতে সক্ষম, জলে নেমে, নদীর চরে কাদার মধ্যে নেমে খাদ্য খেতে পারে উষ্ণ ও আদ্র আবহাওয়ায় স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে দেখতে বাদামী, ধূসর, সাদাটে রঙের হয়, লেজ টা খুব ছোট হয় গায়ের পশম খুব মোটা, মুখের অংশ পেটের নিচে পায়ে পশম খুব ছোট হয়, স্ত্রী ভেড়ার শিং থাকে না, পূরুষ ভেড়া শিং থাকে। এদের ওজন ১৩ থেকে ১৫ কেজি পর্যন্ত হতে পাড়ে, ভেড়া স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরের প্রয়োজন, এবং সঠিক মাপের ঘর থাকা জরুরী, একটি স্ত্রী ভেড়া জন্য ৮-১০ বর্গফুট পূঃ ভেড়ার জন্য ১৫-২০ বর্গফুট জায়গা দরকার। বেশির ভাগ স্ত্রী ভেড়া বছরের ২টি সময়ে মে-জুন বা সেপ্টেম্বর–অক্টোবর মাসে গরম হয়, স্ত্রী ভেড়া অন্যান্য প্রানীদের মতো বহিঃ প্রকাশ করে না।

গর্ভবতী অবস্থায় ও বাচ্চার পরিচর্যাঃ

গর্ভবতী অবস্থায় পেট ভরে সবুজ ঘাস খাবে, ভেড়া প্রতি ১৫০ – ২০০ গ্রাম সুষম দানা খাবার দিতে হবে। বাচ্চা দেওয়ার ৫-৭ দিন আগে অন্য ভেড়াদের থেকে আলাদা করে দিতে হবে ঘরের মেঝে খড় বিছিয়ে দিতে হবে। বাচ্চা দেওয়ার পর জীবানুনাশক ঔষধ দিয়ে ভেড়া পিছনের

দিকটা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে, বাচ্চা দেওয়ার ২-৩ দিন হাল্কা খাবার ও পর্যাপ্ত জল দিতে হবে। বাচ্চা জন্ম গ্রহণের পর বাচ্চার নাক মুখ, সারা দেহ পরিষ্কার করে দেওয়া নাভিটা বাচ্চার দেহে থেকে ১$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি ছেড়ে বেঁধে বাকি অংশটা ধারালো নতুন ব্লেড দিয়ে কেটে দেওয়া এবং কাটা অংশে জীবানু নাশক লাগিয়ে দেওয়া। বাচ্চা জন্ম গ্রহণের ১ থেকে ১$^{১}/_{২}$ ঘণ্টা পর গাজলা দুধ খাওয়ানো, দিনে ৩-৪ বার মায়ের দুধ খাওয়ানো। বাচ্চার দেহের ওজনের ১/১০ ভাগ, দুধ খাবে জন্মানোর ৬-৭ দিন এবং বাচ্চা মায়ের সাথে থাকবে। এর পর বাচ্চা মাঠে চরতে পাঠানো, ২ সপ্তাহ বয়স পর থেকে বাচ্চাকে কচি ঘাস কচি পাতা, দানা খাদ্য খেতে দেওয়া, ৩ মাস পর থেকে মার কাছ থেকে বাচ্চাকে আলাদা করে দিতে হবে।

ভেড়ার খাবারঃ

খাবারের উপর নির্ভর করে ভেড়ার বৃদ্ধি, বৃদ্ধি কমে গেলে মাংস উৎপাদন কমে যায়, তার ফলে লাভের অংশ কমে যায় যদি মাঠে ছেড়ে খাওয়ানো হয় এবং ৭০% পর্যন্ত নিজে সংগ্রহ করে নেয়, সারাদিনে ৮-১০ ঘণ্টা মাঠে ছেড়ে খাওয়ানো পর প্রতি বাচ্চা পিছু ১০০-১৫০ গ্রাম দানা জাতীয় খাবার দেওয়া, এবং প্রতি দিন খাবারের সাথে ২ থেকে ২$^{১}/_{২}$ লিটার জল খাবে।

ভেড়ার রোগঃ

সংক্রামক রোগের দ্বারা বিভিন্ন রোগের স্বীকার হয় কারন এরা দল বেঁধে থাকে। তবে গাড়োল প্রজাতীর ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি, রোগ সাধারনত ৪ রকম হতে দেখা দেয়- ১) অপুষ্টিজনিত, ২) কৃমিজনিত, ৩) ভাইরাস জনিত রোগ, ৪) ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ অপুষ্টি জনিত রোগঃ- যে পরিমাণ সুষম খাদ্য দরকার তার চাহিদাপূরণ না হলে অপুষ্টি জনিত রোগে আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত থেকে দূর করতে দেহের ওজন অনুযায়ী সবুজ ঘাস, দানাজাতীয় সুষম খাদ্য খনিজ পদার্থ, ভিটামিন প্রভৃতি খাওয়ানো।

কৃমিজনিত রোগঃ

ক) আভ্যন্তরীণ পরজীবী যেমন – ফিতাকৃমি, চ্যাপ্টাকৃমি, প্রটোজোয়া (রক্ত আমাশয়) সংক্রমণ দেখা দেয়, এর ফলে পাতলা পায়খানা হয়, ওজন কমে যায় চোয়ালের নীচে ফুলে যায়, নির্দিষ্ট মাত্রানুযায়ী সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ঔষুধ খাওয়ালে রক্ষা পায়।

খ) বাহ্যিক পরজীবীঃ- ভেড়ার পশমের মধ্যে দল বেঁধে এঁটুলি উকুন মাইটস পরজীবীরা থাকে, এবং ভেড়ার রক্ত শোষন করে দূর্বল করে দেয়, বৃদ্ধি হ্রাস করে বাহ্যিক পরজীবীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বছরে ২ বার ফেব্রুয়ারী

মার্চ ও অক্টোবর নভেম্বর মাসে ভেড়াকে ঔষুধ গোলা জলে স্নান করানো।

ভাইরাস জনিত রোগঃ

ক) পি, পি, আর এটি একটি ভাইরাস ঘটিত ছোঁয়াচে রোগ নাক দিয়ে সর্দি ঝরে, চোখে পিচুটি পরে, জ্বর হয়, পাতলা পায়খানা হয় বেশি ভাগ ক্ষেত্রে ভেড়া মারা যায়, প্রথম অবস্থায় রোগ নির্ণয় করে এ্যান্টি বায়োটিক ব্যবহার করলে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়, তবে প্রতি বছর একবার পি পি আর রোগের ঠিকা দিলে রোগ নিয়ন্ত্রন করা যায়।

খ) খুরাই রোগ ভাইরাস ঘটিত রোগ পায়ের খুরে ও মুখে ঘা হয়, প্রথম অবস্থায় জ্বর হবে। জিভের ওপরে জল ভরা ফোস্কা হয়, পরে ফেটে গিয়ে ঘা হয়ে যায়। প্রতি বছর ২ বার এই রোগের টিকা দিলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

গ) বসন্ত রোগটি নিশ্বাস প্রশ্বাস ও চামড়ার ক্ষতের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়, দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়, নাক ও চোখ দিয়ে জল পড়ে, মুখে পালান, লেজের নীচে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে, বসন্তের গুটি দেখা দেয়, সঠিক সময়ে টিকাকরন প্রতিরোধের এক মাত্র উপায়।

ব্যাক্টেরিয়াঃ

ক) এন্টারোট ক্রিমিয়া ব্যাকটেরিয়া ঘটিত একটি রোগ, খাদ্য ও জলের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়, পেট ব্যথা, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, এক মাত্র প্রতিকার সঠিক সময়ে টিকার ব্যবস্থা করা।

খ) নিউমোনিয় – জ্বর সর্দ্দি হয় জাবর কাটা বন্ধ করে দেয়, এ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

গাড়োল ভেড়ার টিকাকরণের সময় সারণীঃ

ক্রমিক সংখ্যা	রোগের নাম	মাত্রার	কোথায় ব্যবহার করতে হবে	কবার
১)	পি পি আর	১ মিলি	চামড়ার নিচে	প্রতি বছরে একবার
২)	বসন্ত	১ মিলি	ঐ	প্রতি বছরে একবার
৩)	খুরাই	১ মিলি	ঐ	প্রতি বছরে দুবার
৪)	এন্টারোট ক্রিমিয়া	২ মিলি	ঐ	প্রতি বছরে একবার

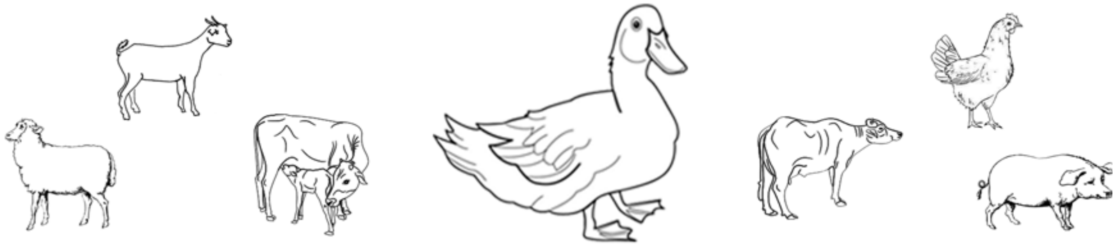

হাঁস পালন নিয়ে কিছু কথা

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলাতে পুকুরের অভাব নেই সেই পুকুরে প্রচুর গেঁড়ি গুগলি, বিভিন্ন জলজ পোকা মাকড় ও জলজ উদ্ভিদ থাকে যে গুলি হাঁসের খাবার হিসাবে ভাবা যায়। হাঁস পালনে ঝামেলা কম, সকালে ছেড়ে দিলে সারাদিন পুকুরে চরে চরে খাবার সংগ্রহ করে খায় আবার সন্ধ্যাতে বাড়ি ফিরে আসে। অন্যদের চেয়ে কম অসুখ বিসুখের সংখ্যা কম, বাড়ির মহিলাদের সাথে গলার স্বরের সাথে দারুন পরিচিত হয় সন্ধ্যার পর যদি না আসে মহিলারা ডাকলে হাঁস চলে আসে, গরম সহ্য করার ক্ষমতা বেশি, পরিচর্যা ও পরিশ্রম কম, ডিমের ওজন বেশি ও অধিক পুষ্টিকর সেই কারনে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে হাঁস পালন বিশেষ ভাবে লাভ জনক। বিশেষ করে খাঁকি ক্যাম্পবেল জাতের হাঁস বাৎসরিক ডিমের সংখ্যা প্রায় ২৫০-২৭০টি, এদের ২ কেজি- ৩ কেজি পর্যন্ত ওজন হয়, প্রায় টানা ১$^{১}/_{২}$ থেকে ২ বৎসর ডিম দেয়।

হাঁসের ঘর ও খাবারঃ

হাঁস জলচর প্রানী হওয়ায় জলে সাঁতার কাটতে বেশি ভালোবাসে, ৫ কাটা জলাশয়ে ৫০-৫৫ টি হাঁস জলাশয়ে রেখে পালন করা যায়, রাত্রিতে থাকার জন্য প্রতি হাঁস পিছু ৩-৪ বর্গফুট জায়গা হলে চলে। ঘরগুলি জীবানুমুক্তও, শুকনো স্বাভাবিক আলো বাতাস যুক্ত থাকতে হবে। ঘরের মেঝে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ঘর যেন বৃষ্টি জলের ঝাপটা না লাগে দিনের বেলায় ঘরের মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশ করে সেই দিকে লক্ষ দেওয়া হাঁসের ঘর চওড়া দরজাযুক্ত পূর্ব বা দক্ষিণমুখী হতে হবে। হাঁসকে ঘরে রেখে কেনা খাবার খাইয়ে পালন করলে বেশি লাভ জনক করা সম্ভাবনা কম। হাঁসকে পুকুরে ছাড়তে হবে, এবং পুকুরের পরিবেশ গেঁড়ি গুগলি, ও জলজ উদ্ভিদ যেমন অ্যাজোলা বাড়ার দিকে লক্ষ রাখা, হাঁস সারাদিন পুকুরে চরে গেঁড়ি গুগলি, বিভিন্ন পোকা মাকড় খাবে। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরলে বাড়িতে যে উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারি, ভাতের ফ্যান, সেই গুলির সাথে ধানের কুঁড়ো ও অ্যাজোলা মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। যদি সম্ভব হয় গমভাঙা বা চালের খুঁদ মাছের পোঁটা বা মাছের ফেলে দেওয়া অংশ, ও এক চিমটা হলুদ ও কয়েক কোয়া রসুন দিয়ে ফুটিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

হাঁসের অসুখ ও তার প্রতিকারঃ

অসুখ সাধারণত খুব কম হয়, যদি রোগে আক্রান্ত হয় তাকে চিকিৎসা করে বাঁচালেও তার থেকে বেশি উৎপাদন পাওয়া সম্ভাবনা কম, হাঁস অসুখ হলে তাকে সুস্থ করে তোলার থেকে যাতে হাঁস রোগে আক্রান্ত না হয় তার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা দিকে জোর দেওয়া, যে সমস্ত প্রতিষেধক টিকা আছে সেগুলি নিয়মিত দেওয়া ব্যবস্থা করা।

হাঁসের সাধারণত যে রোগগুলি দেখা যায়ঃ

ক) ডাক প্লেগ, খ) ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস,
গ) ডাক কলেরা, ঘ) কৃমিঘটিত, ককিসিডিওসিস রোগও হয়।

প্রতিকারঃ

ক) ডাক প্লেগ রোগ সে কোনো বয়সের হাঁসের হতে পারে, আক্রান্ত হলে নাক, চোখ দিয়ে জল পড়ে চোখে পিচুটি জমে, শ্বাস কষ্ট হয়, সাদা ও সবুজ রঙের পায়খানা হতে থাকে এক দুদিনে মধ্যে মারা যায়, প্রতিষেধক টিকাই এক মাত্র বাঁচার পথ।

খ) ডাক ভাইরাস, (হেপাটাইটিস) সাধারণত ২১ দিনের কম বয়সের হাঁসের এই রোগ বেশি হয় আক্রান্ত হলে হাঁস খায় না, চোখ বন্ধ থাকে, সাদা পায়খানা করতে থাকে ঝিমুনি হয় পরে মারা যায়। প্রতিষেধক টিকা ব্যবস্থা করা।

গ) ডাক কলেরা সব বয়সের হাঁসেদের এই রোগ হতে পারে নাক চোখ দিয়ে জল পড়ে, হাঁস খায় না, সবুজ পায়খানা হয়, ১-২ দিনের মধ্যে মারা যায় প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা করলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ঘ) কৃমিঘটিত, ও ককিসিডিওসিস রোগ প্রায় হয় নিয়মিত পরিষ্কার ও শুকনো সুষম খাবার খাওয়ালে প্রতিষেধক খাওয়ানো ও দুমাস অন্তর একবার কৃমির ওষুধ খাওয়ালে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

হাঁসের টিকাকরনঃ

টিকার নাম	টিকা দেওয়ার সময়	টিকার মাত্রা
ডাক প্লেগ	প্রথমবার- ২ সপ্তাহ বয়সে, ২বার ১০ সপ্তাহে বয়সে, ৩বার ২৪ সপ্তাহ বয়সে, এরপর বছরে ২বার	০.৫ মিলি চামড়ার নিচে
ডাক ভাইরাস, হেপাটাইটিস	১ দিনের বাচ্চাকে টিকা দেওয়া	
ডাক কলেরা	২-৩ মাস বয়সে, ২বার প্রথম টিকা দেওয়া ১-২ মাস পরে, তারপর বছরে ২বার	০.৫ মিলি চামড়ার নিচে

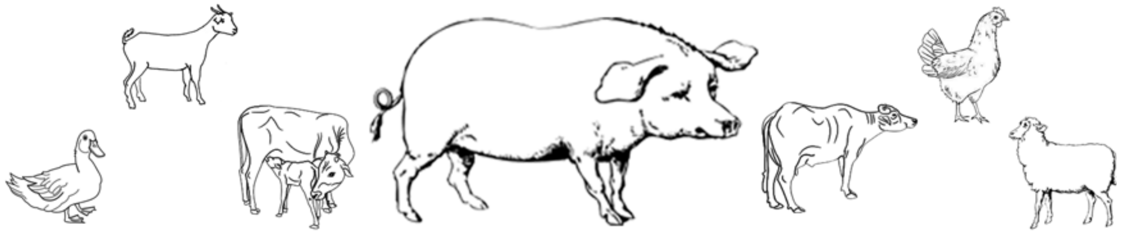

শূকর পালনের কিছু কথা

গৃহপালিত প্রানীদের মধ্যে একমাত্র শূকর প্রাণী সবচেয়ে বেশি বাচ্চা দেয় এবং এদের বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এদের বংশবৃদ্ধি হার বেশি বছরে গড়ে ১৬-২০টি বংশবৃদ্ধি হয়। যদি ১০টি শূকর পালন করা হয়। তাহলে বছরে ১৪০-১৭০টি বাচ্চা দেয়, সে কারনে শূকরী পালন বেশি লাভজনক, আমাদের রাজ্যে তিন ধরণের শূকর পালন করা হয়,

১) কালো রঙের দেশী শূকর,
২) সাদা রঙের বিদেশী শূকর
৩) কালো দেশী ও সাদা বিদেশী শূকরের মিলনে শঙ্কর জাতের শূকর তবে দেখতে যাদের দৈহিক গঠন লম্বাটে

শূকরী পালনে ১৪-১৬টি বা তার বেশি বাঁট থাকে, পিছনের পা দুটি বেশ ছড়ানো হবে শূকরী স্বভাব খুব শান্ত হবে। এমন শূকর পালন করা খুবই লাভজনক।

শূকরের স্বাস্থ্য ও বাসস্থান শূকরের সঠিক বৃদ্ধি নির্ভর করে শূকরের থাকার ঘর, ঘরের মেঝে সব সময় শুকনো হবে ঘরের উচ্চতা ৬ ফুট থাকবে, প্রতিটি শূকরের (২-৬ মাস বয়স) জন্য ১০-১৬ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঘরের আয়তন বাড়াতে হবে তবে ১টি প্রজননক্ষম শূকরী ঘরের জন্য ৫৫-৭৫ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন, শূকরের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো প্রয়োজন কারন শরীর বৃদ্ধি, প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি, নীরোগ রাখা যায় ১ দিন বয়স থেকে ১৫ দিন বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাবে ১৫ দিনের পর থেকে দানা জাতীয় খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন হবে, ১ মাসের বয়সের বাচ্চাদের জন্য ১৫ দিন থেকে ১ মাস ২০০ গ্রাম দৈনিক খাদ্য প্রয়োজন ১-২ মাসের জন্য ৫০০ গ্রাম, ২-৩ মাসের জন্য ১ কেজি, ৩-4 মাসের জন্য ১.২৫০ গ্রাম, 4-৫ ১৫০০ গ্রাম, ৫-৬ মাস ২ কেজি, প্রজননক্ষম শূকর জন্য ৩ কেজি খাবার প্রতিদিন প্রয়োজন। খাদ্যের সাথে সাথে নলকূপের জল প্রতিদিন খাওয়ানো গড়ে ২ থেকে ৬ লিটার জল দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা।

শূকরের রোগঃ

প্রাণী মাত্রই রোগ হবে এবং রোগে আক্রান্ত হলে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে রোগ যাতে না হয় তার জন্য আগাম আচারন বিধি মেনে চললে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগ ব্যাধি বন্ধ করা যায় সেটা সবচেয়ে ভালো ব্যবস্তাপনা।

১) বাসস্থান এমন ভাবে তৈরী করতে হবে প্রচুর আলো, বাতাস প্রবেশ করতে পারে।
২) খাবারের জায়গা ও জলের জায়গা প্রতিদিন, ঘর ও ঘরের চারপাশ, জল বের হওয়ার ড্রেন পরিষ্কার করা, খাবারের পাত্র সাবান দিয়ে প্রতিদিন ধোয়া।
৩) ঘরের চারপাশে রোগ জীবানু মুক্ত করার জন্য সপ্তাহ একবার ফিনাইল ছড়িয়ে দিয়ে চারপাশ জীবানুমুক্ত করা
৪) কোন সময়েই বেশি সংখ্যায় শূকর না রাখা কারন বয়স অনুসারে থাকার জায়গা প্রয়োজন হয়
৫) অত্যাধিক গরম ও ঠান্ডা থেকে রক্ষা করা। শূকর বেশি গরম সহ্য করতে পারে না, বিশেষ করা বাচ্চা শূকর। এর ফলে স্বাস্থ্যে ক্ষতি হয়
৬) বাচ্চা জন্মগ্রহণের পর যাতে বাচ্চা মায়ের দুধ ঠিক মতো পায় তার জন্য যত্নবান হওয়া
৭) সঠিক মাত্রায় ও নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো
৮) কোন শূকর অসুস্থ হলে তাকে আলাদা ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা
৯) নতুন বাচ্চা সংগ্রহ করার সময় সঠিক বয়স ও ওজন দেখে সুস্থ শূকর সংগ্রহ করা
১০) মারত্মক রোগের জন্য আগাম নিয়মিত টিকা দেওয়া

শূকরের মারাত্মক রোগ কলেরা (সোয়াইন ফিভার)

এটি শূকরের মারাত্মক রোগ সবচেয়ে বেশি মারা যায় এবং ছোঁয়াচে রোগ আক্রান্ত শূকরদের সংস্পর্শে কোন শূকর এলে তাদের এই রোগ হতে পারে এই রোগে চিকিৎসা নেই বলা যায়, আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া নিয়মিত ভাবে টিকা দেওয়া, বাচ্চা জন্মাবার পর সাত দিনের মধ্যে টিকা দেওয়া, আট সপ্তাহ বয়স হলে টিকা দেওয়া, এরপর প্রতি বছর একবার টিকা দেওয়া।

AHEAD Initiatives

নবদিশা-র পক্ষে ৫/১/২/জি, কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা – ৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।